

চোখের বালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ কালঃ ১৯৯৮

Published by

porua.org

সূচনা

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে, ‘চোখের বালি’ উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দূরুহ। সব চেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে, ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু, আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সে দিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহসম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা। বস্তুত, ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প-সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উন্মাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানাঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত, এখনো হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলাভাষায় আর প্রকাশ পায় নি। তার পরে ঐ পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শান্তি, এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে, এমন-কি কাব্যেও, মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তার পরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দাফন করে

তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্ৰেৰ সেই রিপুকে কুণ্ঠসিত অবকাশ
দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন।
পশুশালাৰ দৰজা খুলে দেওঘা হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো
অসংযত হয়ে। সাহিত্যেৰ নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ
দেওঘা নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই
পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বৈশাখ ১৩৭৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চো খে র বা লি

চোখের বালি

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্ৰের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্য দিয়া পড়িল। দুইজনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্ৰকে ধরিয়া পড়িলেন, “বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো মুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে— তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।”

মহেন্দ্ৰ কহিল, “মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরো ঢের আছে।”

রাজলক্ষ্মী। মহিন, ঐ তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটা পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্ৰ। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাম্বক দোষ নয়।

মহেন্দ্ৰ শৈশবেই পিতৃহীন। মা সঙ্কল্পে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতে ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তবু মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের খলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার-বিহার আরাম-বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না।

এবারে মা যখন বিনোদিনীর জন্য তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন তখন মহেন্দ্ৰ বলিল, “আচ্ছা, কন্যাটি একবার দেখিয়া আসি।”

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, “দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার করা মিথ্যা।”

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল; কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভদৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর সহিত যখন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে, তখন মহেন্দ্ৰের কড়ি সুর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চিতচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল মহেন্দ্ৰের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; অবশেষে দুই-চার দিন আগে সে বলিয়া বসিল, “না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।”

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্ৰ দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে। এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য

করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহপ্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।

মহেন্দ্ৰের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্ৰকে দাদা এবং মহেন্দ্ৰের মাকে ম। বলিত। মা তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্ৰের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, “বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—”

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, “মা, ঐটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্ৰ ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি; কিন্তু কন্যার বেলায় সেটা সহিবে না।”

রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, ‘বিহারী আবার বিয়ে করিবে! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।’

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর-একটুখানি বাড়িল।

বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারী মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক।

তখন রাজলক্ষ্মী তাহার জন্মভূমি বারাসতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্ৰ হাসিয়া কহিল, “ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।”

বছর-তিনেক পরে আর-একদিন মাতাপুত্রের কথা হইতেছিল।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।”

“কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ।”

“পাছে বউ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।”

মহেন্দ্ৰ কহিল, “ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।”

মা হাসিয়া কহিলেন, “শোনো একবার ছেলের কথা শোনো!”

মহেন্দ্র কহিল, “বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি-বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাহার সদ্যসমাগত বিধবা জাকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, “শোনো ভাই মেজোবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?”

কাকী কহিলেন, “এ তোমার বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার যা তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলের মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।”

এ কথা রাজলক্ষ্মীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে-কটি কথা বলিলেন তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাখা নহে। কহিলেন, “আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজোবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।”

রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে।

মেজোবউ কহিলেন, “তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।”

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, “আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর-কাহারো দরকার হইবে না।”

মেজোবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হইল।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর-কিছুই ছিল না, ইহা সে নিশ্চয়ই জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোনঝি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সন্তানহীনা বিধবা কোনো সুত্রে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া সুখী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে সে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাহার ঘরে যখন গেল তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্তর্পূর্ণা তাহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুষ্ক

বিমর্ষমুখে বসিয়া ছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দের চোখে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া শ্লিঙ্কস্বরে ডাকিল, “কাকীমা।”

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আয় মহিন, বোস্।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।”

অন্নপূর্ণা মহেন্দের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছসিত অশ্রু কষ্টে সম্বরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্তনা দিবার জন্য আহ্বারান্তে হঠাৎ মনের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, “কাকী, তোমার সেই-যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে তাহাকে একবার দেখাইবে না?”

কথাটা উচ্চাচরণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, “তোরা আবার বিবাহে মন গেল নাকি মহিন।”

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আমার জন্য নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।”

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দ্বারের কাছে আসিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।”

মহেন্দ্র কহিল, “পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।”

মা কহিলেন, “তোরা পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।”

মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেখিবা মাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন। ফাঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কী গো মেজোঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?”

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভুলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোলে নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, “এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী! এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।”

অন্নপূর্ণা কহিলেন, “সে কি হয় মহিন। এখন, না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।”

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, “চলো তো, পছন্দ না হইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।”

বিহারী কহিল, “সে কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া ‘পছন্দ হইল না’ বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।”

মহেন্দ্র কহিল, “সে তো উত্তম কথা।”

বিহারী কহিল, “কিন্তু তোমার পক্ষে অন্যায় কাজ হইয়াছে মহিনদা। নিজে হালকা রাখিয়া পরের স্বন্ধে একপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।”

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, “তবে কী করিতে চাও।”

বিহারী কহিল, “যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব—দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।”

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, “সে কি হয় বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছূতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয় তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ রহিল।”

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, “আমার সেই বেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।”

মা কহিলেন, “কেন, কোথায় যাবি।”

মহেন্দ্র কহিল, “দরকার আছে মা, তুমি দাও-না, আমি পরে বলিব”

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

দুই বন্ধু কন্যা দেখিতে বাহির হইল।

কন্যার জেঠা শ্যামবাজারের অনুকুলবাবু নিজের উপার্জিত ধনের দ্বাৰায় তাঁহার বাগান-সমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র ভ্রাতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছেন। মাসি অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, ‘আমার কাছে থাক; তাহাতে ব্যয়লাঘবের সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকুল রাজি হইলেন না। এমন-কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন!

কন্যাটির বিবাহ-ভাবনার সময় আসিল, কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ‘যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী’ কথাটা খাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অনুকুল বলেন, ‘আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।’ এমনি করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া-গুজিয়া গন্ধ মাখিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। দোতলার দক্ষিণ-বারান্দায় চিত্রিত চিহ্ন চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রূপার বেকাবি ফলমূলমিষ্টানে শোভমান এবং বরফ-জল পূর্ণ রূপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজিজতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণবাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুণ্ডিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বার-জানালায় ছিদ্রগুণ্ডাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস্ কথা, দুটা একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অনুকুলবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।”

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতে একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি বালিকা কোথা হইতে সর্বাস্থে রাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুকুলবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, “লজ্জা কী, মা। বাটা ঐ ওঁদের সামনে রাখো।”

বালিকা নত হইয়া কম্পিত হস্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন-পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে সূর্যাস্ত-আভা তাহার লজ্জিত মুখকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেন্দ্র সেই কম্পাঙ্কিতা বালিকার করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে অনুকুলবাবু কহিলেন,
“একটু দাঁড়া, চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কন্যা। সে
তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।”

বলিয়া তিনি দীঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মহেন্দের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর-একবার
চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আশ্মীয়েরা বলিত, ‘এই
বারোতেরো হইবে।’ অর্থাৎ চোদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু
অনুগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীৰুভাবে তাহার নব-যৌবনারম্ভকে
সংযত সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আদ্র্চিত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কী।”

অনুকুলবাবু উৎসাহ দিয়া কহিলেন, “বলো মা, তোমার নাম বলো।”

বালিকা তাহার অভ্যস্ত আদেশপালনের ভাবে নতমুখে বলিল,
“আমার নাম আশালতা।”

আশা! মহেন্দের মনে হইল নামটি বড়ো করুণ এবং কণ্ঠটি বড়ো
কোমল। অনাথ আশা!

দুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল,
“বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ে না।”

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, “মেয়েটিকে দেখিয়া উহার
মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে।”

মহেন্দ্র কহিল, “তোমার স্বন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হয়
তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।”

বিহারী কহিল, “না, বোধ হয় সহ করিতে পারিব।”

মহেন্দ্র কহিল, “কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা নাহয়
আমিই স্বন্ধে তুলিয়া লই। কী বল।”

বিহারী গম্ভীরভাবে মহেন্দের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, “মহিন্দা,
সত্য বলিতেছ? এখনো ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ করিলে কাকী চের
বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে
পারিবেন।”

মহেন্দ্র কহিল, “তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে
হইয়াযাইত।”